ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা কৌশল

ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ। অনাদিকাল থেকেই জাতীয় অর্থনীতি, কর্মসংস্থান ও আমিষ জাতীয় খাদ্য সরবরাহে এ মাছ অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে। বাংলাদেশের মোট মৎস্য উৎপাদনে উম্মুক্ত জলাশয়ের মাছের অবদান প্রায় শতকরা ৪২ ভাগ এবং ইলিশ মাছের অবদান এককভাবে প্রায় শতকরা ১২ ভাগ। একক প্রজাতি হিসেবে ইলিশ মাছ সর্ববৃহৎ এবং সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। ইলিশ মাছের বার্ষিক উৎপাদন (২০০৯-১০) প্রায় ৩ লক্ষ ১৩ হাজার মে. টন. যার বাজারমূল্য ৭ হাজার কোটি টাকার উর্দ্ধে। জিডিপিতে ইলিশ মাছের অবদান প্রায় ১%। প্রতি বছর ইলিশ মাছ রপ্তানী হতে অর্জিত বৈদেশিক মূদ্রার পরিমাণ প্রায় ২০০ কোটি টাকা এবং এ রপ্তানি ক্রমশ বাড়ছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে আমিষ জাতীয় খাদ্য যোগানের জন্য মাছের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু পরিবেশগত পরিবর্তনের জন্য দেশের অভ্যন্তরীণ জলাশয় সংকোচন ও জলজ পরিবেশ দূষণের ফলে এসকল জলাশয়ে মাছের উৎপাদন প্রতিনিয়ত হ্রাস পাচ্ছে। ইলিশ উৎপাদনের ক্ষেত্রেও উপরোক্ত নিয়ামকগুলির নেতিবাচক প্রভাব পরিদৃষ্ট হচ্ছে। এ ছাড়াও নির্বিচারে জাটকা নিধন, অধিক মাত্রায় ডিমওয়ালা ইলিশ আহরণ ও কারেন্ট জালের অবাধ ব্যবহারের ফলে দেশে ইলিশ সম্পদের ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউট, নদী কেন্দ্র, চাঁদপুর প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে ইলিশের ওপর ধারাবাহিকভাবে গবেষণা পরিচালনা করে আসছে এবং গবেষণার মাধ্যমে জাটকার বিচরণক্ষেত্র, ইলিশের প্রজননক্ষেত্র চিহ্নিত করেছে। জাটকার সর্বোচ্চ প্রাপ্যতার সময়কাল, ইলিশের সর্বোচ্চ প্রজনন মৌসুমের সময় নির্ণয় করতে সক্ষম হয়েছে। গবেষণালব্ধ ফলাফলের সুপারিশ মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নের ফলশ্রুতিতে ইলিশ মাছের উৎপাদন বিগত ২০০৩ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৯-১০ সালে প্রায় ৩ লক্ষ ১৩ হাজার মে. টনে উন্নীত হয়েছে। ইনষ্টিটিউট কর্তৃক প্রাপ্ত সর্বশেষ গবেষণালব্ধ ফলাফলের আলোকে ইলিশ সম্পদ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভূক্ত করে "**ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা কৌশল**" শীর্ষক একটি প্রযুক্তি নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হলো। দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ইলিশ মাছ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়নে এবং সর্বস্তরের জনগণকে এ কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণ ও ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টিতে এই প্রযুক্তি পত্রটি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।
বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউট, নদী কেন্দ্র, চাঁদপুর এর গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে ইলিশ সম্পদের উন্নত ব্যবস্থাপনা কৌশল এবং এর বাস্তবায়নের ফলাফল নিম্নে আলোচনা করা হলো।

উন্নত ব্যবস্থাপনা কৌশল

ইলিশ মাছের বাসস্থান, অভিপ্রয়াণ ও জীবনচক্র

ইলিশ মাছ সাধারণতঃ সমুদ্রের লবনাক্ত পানি হতে মিঠা পানিতে এবং মিঠা পানি হতে সমুদ্রে চলাচল করে থাকে। এ মাছের অটোলিথ গঠনের উপাদানের ক্ষুদ্র মৌলের বিন্যাস পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সাগরের ইলিশ মিঠা পানিতে এবং মিঠা পানি হতে একই মাছ সাগরে পরিভ্রমণের সু¯পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। স্বাদুপানিতে জন্ম গ্রহণকারী ইলিশ মাছ সাগরে অভিপ্রায়ণ করে বয়োপ্রাপ্ত হয়ে ডিম ছাড়ার জন্য পুনরায় স্বাদুপানিতে ফিরে আসে বিধায় ছোট মাছকে বড় হওয়ার সুযোগ প্রদান করলে বেশী উৎপাদন পাওয়া যাবে।

ইলিশ মাছের প্রজাতিগত বৈচিত্র সংরক্ষণ

আমাদের দেশে ৩ প্রজাতির ইলিশ মাছ যথা- টেনুয়ালোসা ইলিশ (*Tenualosu ilisha*) সাধারণভাবে পরিচিত ইলিশ, সামান্য পরিমাণে চন্দনা ইলিশ (*Tenualosu toli*) এবং কালেভদ্রে হিলশা গণের হিলশা কেলি (*Hilsa kelee / kanagurta*) কানাগুর্তা বা গুর্তা প্রজাতির ইলিশ মাছ পাওয়া যায়। সাধারণভাবে জাটকা, চাপিলা, সার্ডিন ও চৌক্কা

দেখতে প্রায় একই রকম হওয়ায় মাঠ পর্যায়ে এ সকল মাছকে সঠিকভাবে সনাক্তকরণ ও মৎস্য আইন বাস্তবায়ন বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। কাজেই ইলিশ সদৃশ প্রজাতিসমূহের শারীরতাত্ত্বিক পার্থক্যের উপর ভিত্তি করে সহজে সনাক্তকরণের উপায় নির্ধারণ করা হলে মাঠ পর্যায়ে সৃষ্ট জটিলতা দূর হবে।

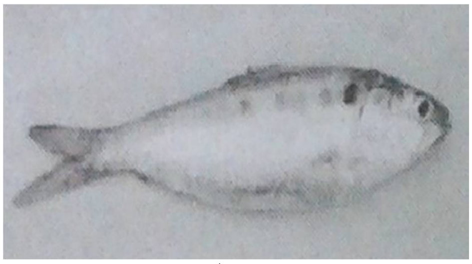

জাটকা,

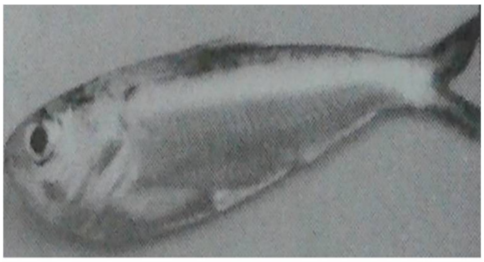

চাপিলা,

সার্ডিন

চৌক্কা

সারণি ১. জাটকা, চাপিলা, সার্ডিন ও চৌক্কা মাছের পার্থক্য নির্ণয়ের বৈশিষ্ট্য

জাটকা	চাপিলা	সার্ডিন	চৌক্কা
১। জাটকার পিঠের ও পেটের দিক প্রায় সমভাবে উত্তল	১। চাপিলার পিঠের চেয়ে পেটের দিক বেশী উত্তল ও প্রশস্ত	১। সার্ডিনের পিঠের দিকের চেয়ে পেটের দিক অপেক্ষাকৃত বেশী উত্তল ও চ্যাপ্টা	১। চৌক্কার পিঠের ও পেটের দিক প্রায় সমভাবে উত্তল
২। চাপিলার তুলনায় জাটকার দেহ পার্শ্বীয়ভাবে পুরু	২। চাপিলার দেহ পার্শ্বীয়ভাবে পাতলা	২। জাটকা ও চাপিলার দেহের চেয়ে সার্ডিনের দেহ পার্শ্বীয়ভাবে পুরু	২। জাটকা ও সার্ডিনের মত চৌক্কার দেহও পার্শ্বীয়ভাবে পুরু
৩। আঁইশের আকৃতি বড়, নিয়মিত সারিতে সাজানো এবং পার্শ্বরেখা বরাবর এক সারিতে আঁইশের সংখ্যা ৪০-৫০টি	৩। আঁইশের আকৃতি অপেক্ষাকৃত ছোট, পার্শ্বরেখা বরাবর এক সারিতে আঁইশের সংখ্যা ৮০-১২০টি	৩। আঁইশের আকৃতি বড় ও নিয়মিত সারিতে সাজানো থাকে। পার্শ্বরেখা বরাবর এক সারিতে আঁইশের সংখ্যা ৪৩-৪৫টি	৩। আঁইশের আকৃতি বড়, নিয়মিত সারিতে সাজানো থাকে এবং এক সারিতে আঁইশের সংখ্যা ৫৫-৬০টি
৪। চোখের আকৃতি ছোট, এডিপোজ লিড থাকে	৪। চোখের আকৃতি এবং এডিপোজ লিড বড়	৪। চোখের আকৃতি জাটকা ও চাপিলার তুলনায় বড় ও এডিপোজ লিড থাকে	৪। চোখের আকৃতি বড় এবং এডিপোজ লিড থাকে
৫। মাথার আকৃতি লম্বাটে ও অগ্রভাগ সুচালো	৫। মাথার আকৃতি ছোট ও অগ্রভাগ ভোঁতা	৫। মাথার আকৃতি বড় ও অগ্রভাগ সামান্য ভোঁতা	৫। জাটকার মত চৌক্কার মাথার আকৃতি লম্বাটে

			এবং অগ্রভাগ সূচালো
৬। মুখ টারমিনাল, ঠোঁট কিছুটা পুরু, চোয়াল প্রায় সমান, নিচের চোয়াল উপরের চোয়ালকে ছাড়িয়ে যায়না	৬। মুখ উপরের দিকে উঠানো (upturned), ঠোট পাতলা, চোয়াল অসমান, নিচের চোয়াল উপরের চোয়ালকে ছাড়িয়ে যায়	৬। মুখ টারমিনাল, চোয়াল প্রায় সমান ও নিচের চোয়াল সামান্য পুরু	৬। মুখ কিছুটা উপরের দিকে উঠানো, ঠোঁট পুরু, চোয়াল অসমান, নিচের চোয়াল উপরের চোয়ালকে ছাড়িয়ে যায়
৭। বক্ষ কাটা (Scute): প্রিপেলভিক ১৫-১৬টি এবং পোষ্ট পেলভিক ১১-১৬টি (মোট ৩০-৩৩টি)	৭। বক্ষ কাটা (Scute): প্রিপেলভিক ১৮-১৯টি এবং পোষ্ট পেলভিক ৮-১০টি (মোট ২৬-২৯টি)	৭। বক্ষ কাটাঃ প্রিপেলভিক ১৬-১৮টি এবং পোষ্ট পেলভিক ১২-১৪টি (মোট ৩০-৩২টি)	৭। বক্ষ কাটাঃ প্রিপেলভিক ১৬-১৭টি, পোষ্টই পেলভিক ১২-১৩টি (মোট ২৭-৩০টি)
৮। পৃষ্ঠ পাখনা বক্ষ পাখনার সামান্য সম্মুখে থাকে এবং ১১-১৬টি শাখাযুক্ত (branched) রে (rays) থাকে	৮। পৃষ্ঠ পাখনা বক্ষ পাখনার সোজাসুজি উপরে থাকে এবং ১৬টি শাখাযুক্ত রে থাকে	৮। পৃষ্ঠ পাখনা বব পাখনার অনেকটা সম্মুখে থাকে এবং ১৫-১৭টি শাখাযুক্ত রে থাকে	৮। পৃষ্ঠ পাখনা বক্ষ পাখনার সোজাসুজি উপরে থাকে এবং ১৬-১৭টি শাখাযুক্ত রে থাকে
৯। পায়ু পাখনায় ১৪-২৪টি শাখাযুক্ত রে থাকে	৯। পায়ু পাখনায় ২১-২৪টি পাখাযুক্ত রে থাকে	৯। পায়ু পাখনায় ১৫-১৭টি শাখাযুক্ত রে থাকে	৯। পায়ু পাখনায় ২০-২২টি শাখাযুক্ত রে থাকে
১০। গিল ওপেনিং এর পরে একটি বড় কালো ফোঁটা এবং পরে অনেকগুলো ফোঁটা থাকে	১০। চাপিলা মাছেও অনেক সময় জাটকার অনুরূপ ফোঁটা থাকে, অনেক সময় থাকে না	১০। গিল ওপেনিং এর পরে একটি বড় কালো ফোঁটা থাকে	১০। গিল ওপেনিং এর পর কোন ফোঁটা থাকে না
১১। তাজা (Fresh) জাটকার গন্ধ ইলিশ মাছের গন্ধের মত	১১। চাপিলার গন্ধ ইলিশ মাছের মত নয়	১১। সার্ডিনের গন্ধ ইলিশের গন্ধের মত নয়	১১। চৌক্কার গন্ধ ইলিশ মাছের গন্ধের মত নয়
১২। জাটকা রান্না করার সময় বা রান্নার পরে ইলিশ মাছের গন্ধ পাওয়া যায়	১২। চাপিলা রান্না করার সময় বা রান্না করার পরে ইলিশ মাছের গন্ধ পাওয়া যায় না	১২। সার্ডিন রান্না করার সময় বা রান্নার পরে ইলিশ মাছের মত গন্ধ পাওয়া যায় না	১২। চৌক্কা মাছ রান্না করার সময় বা রান্না করার পরে ইলিশ মাছের মত গন্ধ পাওয়া যায় না
১৩। জাটকা বা ইলিশের মোট দৈর্ঘ্যরে মধ্যে ষ্টান্ডার্ড দৈর্ঘ্য ৮৪.২%; ফর্ক দৈর্ঘ্য ৮৭.৮%; প্রি-এনাল দৈর্ঘ্য ৫৯.৮%; প্রি-ডরসাল দৈর্ঘ্য ৩৬.১%; প্রি-পেলভিক দৈর্ঘ্য ৩৭.৬%; প্রি-পেকটোরাল দৈর্ঘ্য ২২.৪%; বডি ডেপথ ২৭.৫%; হেড	১৩। চাপিলা মাছের মোট দৈর্ঘ্যরে মধ্যে ষ্টান্ডার্ড দৈর্ঘ্য ৭৯.৭%; ফর্ক দৈর্ঘ্য ৮৬.২%; প্রি-এনাল দৈর্ঘ্য ৫৫.৫%; প্রি-ডরসাল দৈর্ঘ্য ৩৮.০%; প্রি-পেলভিক দৈর্ঘ্য ৩৭.৫%; প্রি-পেকটোরাল দৈর্ঘ্য ১৯.৬%; বডি ডেপথ ২৭.৭%; হেড	১৩। সার্ডিনের মোট দৈর্ঘ্যরে মধ্যে ষ্টান্ডার্ড দৈর্ঘ্য ৭৮.১৩%; ফর্ক দৈর্ঘ্য ৮৭.৫%; প্রি-এনাল দৈর্ঘ্য ৪৫.৬৩%; প্রি-ডরসাল দৈর্ঘ্য ৪৩.৭৫%; প্রি-পেলভিক দৈর্ঘ্য ৪৩.৭৫%; প্রি-পেকটোরাল দৈর্ঘ্য ২৩.৭৫%; বডি ডেপথ	১৩। চৌক্কা মাছের মোট দৈর্ঘ্যরে মধ্যে ষ্টান্ডার্ড দৈর্ঘ্য ৭৯.৭৫%; ফর্ক দৈর্ঘ্য ৮৫.২৭%; প্রি-এনাল দৈর্ঘ্য ৬১.৯৬%; প্রি-ডরসাল দৈর্ঘ্য ৩৪.৯৭%; প্রি-পেলভিক দৈর্ঘ্য ৪২.৯৪%; প্রি-পেকটোরাল দৈর্ঘ্য ১৪.১১%; বডি ডেপথ

২২.০% এবং প্রি-অরবিটাল দৈর্ঘ্য ও আই ডায়ামিটার যথাক্রমে হেড দৈর্ঘ্য এর ১৬.৯ ও ১৯.২%	২১.৯% এবং প্রি-অরবিটাল দৈর্ঘ্য ও আই ডায়ামিটার যথাক্রমে হেড দৈর্ঘ্য এর ১৭.৬ ও ২৮.০%	৩৪.৩৮%; হেড দৈর্ঘ্য ২৫.৬৩% এবং প্রি-অরবিটাল দৈর্ঘ্য ০০.০০% ও আই ডায়ামিটার দৈর্ঘ্য ৬.২৫	২৫.৭৭%; হেড ১৯.০২% এবং প্রি-অরবিটাল দৈর্ঘ্য ও আই ডায়ামিটার যথাক্রমে হেড দৈর্ঘ্য এর ১৭.১২ ও ১৫.২১%

ইলিশ মাছের খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস

ইলিশ মাছ মূলতঃ প্লাঙ্কটন বা ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র উদ্ভিদ ও প্রাণিকণা ভোজী। ইলিশ মাছের গিল র‌্যাকার প্রায় চালুনির মত। তাই খাদ্যেও তালিকায় বিশেষ কোন নৈর্বাচনিকতা নেই। প্রজনন ঋতুতে খাদ্য গ্রহণ থেকে প্রায় বিরত থাকে। ইলিশ মাছের আকার, বয়স ও পরিবেশ ভেদে খাদ্য গ্রহণ মাত্রার তারতম্য হয়ে থাকে। তাই ইলিশ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য এ সম্পর্কিত তথ্যাদি জানা প্রয়োজন।

ইলিশ মাছের পরিপক্কতার আকার ও বয়স

ইলিশ মাছের গোনাডের হিষ্টোলজিক্যাল বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, সাধারণতঃ ১+ বৎসর বয়সে ইলিশ মাছ পরিপক্কতা লাভ করে। তবে আবহাওয়ার তারতম্য ও অন্যান্য কারণে অনেক সময় ৮-১০ মাস বয়সেও ইলিশ মাছ পরিপক্ক হতে পারে। দ্রুত বৃদ্ধির পর্যায়ে থাকা মাছ রক্ষা হলে অধিক উৎপাদন পাওয়া যাবে বিধায় ইলিশ মাছের অধিক উৎপাদন নিশ্চিত করতে এর পরিপক্কতার নূন্যতম আকার ও বয়স জানা প্রয়োজন।

পুরুষ-স্ত্রী ইলিশ মাছের অনুপাত ও ডিম ধারণ ক্ষমতা

স্থান, কাল, আকার ও প্রজাতি ভেদে পুরুষ-স্ত্রী ইলিশ মাছের আনুপাতিক হার ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। জাটকা বা কিশোর বয়সে স্ত্রী-পুরুষ মাছের আনুপাতিক হার প্রায় সমান (১ঃ১) এবং এ হার ২৮-৩০ সে.মি. পর্যন্ত বলবৎ থাকে। অতঃপর স্ত্রী মাছের আনুপাতিক হার বৃদ্ধি পায় এবং ৪৪ সে.মি. এর উর্দ্ধ আকারের সকল মাছই স্ত্রী। চন্দনা প্রজাতির (*T. toli*) ইলিশ মাছ লিঙ্গ পরিবর্তন করে পুরুষ মাছ স্ত্রী মাছে রূপান্তরিত হয়। এ প্রজাতির ২২.০ সে.মি. আকার পর্যন্ত সকল মাছই পুরুষ, ২২.০ সে.মি. হতে ২৫/২৬ সে.মি. আকারের মাছের লিঙ্গ পরিবর্তন ঘটে এবং ২৬ সে.মি. এর উর্দ্ধ আকারের সকল মাছই স্ত্রী।

ইলিশ মাছের বয়স ও আকারভেদে ডিম ধারণ ক্ষমতার তারতম্য হয়ে থাকে এবং দৈর্ঘ্য ও ওজনের সাথে ডিমের পরিমাণ সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। ইলিশ মাছে সর্বোচ্চ ২১ লক্ষ পর্যন্ত ডিম পাওয়া যায়। বড় মাছে বেশী ডিম এবং ছোট মাছে কম সংখ্যক ডিম থাকে। প্রধান প্রজনন মৌসুমে ইলিশ মাছ রক্ষা করা সম্ভব হলে প্রাকৃতিকভাবে সর্বোচ্চ পরিমাণে ইলিশের ডিম এবং পরবর্তীতে জাটকা হিসাবে পাওয়া যেতে পারে যা ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

ইলিশ মাছের প্রজননকাল ও সর্বোচ্চ প্রজনন মৌসুম ও প্রজনন পৌনপুনিকতা

ইলিশ মাছের পরিপক্কতার মাত্রা (জি.এস.আই.) প্রজননক্ষম মাছের পরিমাণ এবং প্রজননোত্তর মাছ (Spent Fish) পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দু'টি প্রধান যথাঃ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস সর্বোচ্চ এবং জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী দ্বিতীয় সর্বোচ্চ প্রজনন মৌসুম নিরূপণ করা হয়েছে। অবশ্য ইলিশ মাছ প্রায় সারা বৎসর কম-বেশী প্রজনন করে থাকে। আবহাওয়ার তারতম্যের কারণে ইলিশ মাছের প্রজনন মৌসুম নভেম্বর/ডিসেম্বর মাস পর্যন্তও বর্দ্ধিত হতে পারে। ইতোমধ্যে সনাক্তকৃত ইলিশ মাছের প্রধান প্রজননক্ষেত্রে প্রধান প্রজনন মৌসুমে ১৫-২৪ অক্টোবর পর্যন্ত প্রতি বছর ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে যা বর্তমানে অমাবশ্যা ও পূর্ণিমার তারিখের সাথে সঙ্গতি রেখে সংশোধনের

উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত আইন বাস্তবায়নের ফলে ইলিশের প্রাকৃতিক প্রজননে অভাবিত সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

জাটকা সংরক্ষণ ও অভয়াশ্রম ঘোষণা

জাটকা রক্ষা আইন ও জাটকা ইলিশের অভয়াশ্রম বাস্তবায়নের ফলে প্রধান প্রজনন মৌসুমে জাটকার প্রাচুর্য বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত ২০০৫ সালে মেঘনা নদীতে পরীক্ষামূলক জাটকা আহরণে একক প্রচেষ্টায় ধৃত জাটকার পরিমাণ ছিল ০.৯৪ কেজি/১০০ মিটার দৈর্ঘ্যরে জালে/ প্রতি ঘন্টায় যা ২০১০ সালে ২.৪৪ কেজিতে উন্নীত হয়েছে। অর্থাৎ জাটকার প্রাচুর্য প্রায় ১৬০% বৃদ্ধি পেয়েছে। জাটকার প্রাচুর্য পরীক্ষা করে গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে মেঘনা নদীর বিভিন্ন এলাকায় নতুন অভয়াশ্রম ঘোষণার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। জাটকা রক্ষা কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন এবং সুফলভোগীদের স্বতঃস্ফুর্ত অশগ্রহণ ইলিশ উৎপাদনে ইতিবাচক প্রভাব রাখতে পারে।

সারণি ২. নিম্ন পদ্মা নদীতে বাস্তবায়নাধীন নতুন অভয়াশ্রমের সীমানা এবং মাছ ধরা নিষিদ্ধকালীন সময়

জিপিএস পয়েন্ট		সীমানা	মাছ ধরা নিষিদ্ধকালীন সময়
উত্তর-পূর্ব	শরিয়তপুর জেলার ভেদরগঞ্জ উপজেলার কাছিকাটা পয়েন্ট (জিপিএস পয়েন্ট ২৩°১৯.৮' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০°৩২.৬' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ)	উত্তরে শরিয়তপুর জেলার নরিয়া-ভেদরগঞ্জ উপজেলা এবং দক্ষিণে চাঁদপুর জেলার মতলব এবং শরিয়তপুর জেলার ভেদরগঞ্জ উপজেলার মধ্যে অবস্থিত নিম্ন পদ্মা নদীর ২০ কি.মি. এলাকা	প্রতি বৎসর মার্চ হতে এপ্রিল মাস পর্যন্ত সকল প্রকার মাছ ধরা নিষিদ্ধ থাকবে
উত্তর-পশ্চিম	শরিয়তপুর জেলার নরিয়া উপজেলার ভোমকড়া পয়েন্ট (জিপিএস পয়েন্ট ২৩°১৮.৪' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০°২৮.৮' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ)		
দক্ষিণ-পূর্ব	চাঁদপুর জেলার মতলব উপজেলার বেপারীপাড়া পয়েন্ট (জিপিএস পয়েন্ট ২৩°১৫.৯' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০°৩৭.৭' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ)		
দক্ষিণ-পশ্চিম	শরিয়তপুর জেলার ভেদরগঞ্জ উপজেলার তারাবুনিয়া পয়েন্ট (জিপিএস পয়েন্ট ২৩°১৩.৫' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০°৩৫.১' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ)		

মৎস্য অধিদপ্তরের চাহিদা মোতাবেক বর্তমানে প্রস্তাবিত নতুন অভয়াশ্রমের সাথে পূর্বোক্ত অভয়াশ্রমগুলোর জিপিএস পয়েন্ট চিহ্নিত করা হয়েছে। ফলে মাঠ পর্যায়ে মাছ আহরণ নিষিদ্ধকালীন সময়ে মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়নে সম্প্রসারণ কর্মকর্তাদের সুবিধা হচ্ছে।

ইলিশ মাছের অতি আহরণমাত্রা ও ক্ষতিকর জাল ও জালের ফাঁসের আকার নিয়ন্ত্রণ

ইলিশ মাছ সারা বছরই কম-বেশী ধরা হয়, তবে ৫০-৬০% মাছই ধরা পড়ে সর্বোচ্চ প্রজনন মৌসুমে। নির্বিচারে ডিমওয়ালা মাছ ধরা ও জাটকা নিধনের ফলে ইলিশ মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ও নতুন প্রজন্মের প্রবেশন ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়। বিভিন্ন নামের জাল ব্যবহার করে ইলিশ মাছ ধরা হলেও মূলত ৩ পদ্ধতি যথা-১) জালের ফাঁসে আবদ্ধ বা ফাঁস দিয়ে ২) ইলিশ মাছের ঝাঁক ঘিরে এবং ৩) জালের পকেটে ইলিশ মাছ ধরা হয়। জাটকা ধরার বিভিন্ন প্রকার জালের মধ্যে জগৎ বেড় জাল, বেড়জাল, ফাঁস বা কারেন্ট জাল, পোয়া জাল, বেহুন্দী জাল প্রভৃতি প্রধান।

বিভিন্ন প্রকার জালের মধ্যে জগৎ বেড় জালে শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ, কারেন্ট জালে শতকরা ৪০ ভাগ এবং বেহুন্দীসহ অন্যান্য জালে শতকরা ১০ ভাগ জাটকা ধরা পড়ে। সাম্প্রতিক সময়ে প্রবর্তিত (Introduced) জোয়ারের সময় ডুবন্ত চরের চারপাশ জাল দ্বারা ঘেরাও করে (চরঘেরা জাল) দেশের দক্ষিণাঞ্চলের নদ-নদীতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে জাটকা ধরা হয়। এ প্রেক্ষাপটে নির্বিচারে পোনা ও ডিমওয়ালা মাছ নিধন বন্ধ করা, ক্ষতিকর জাল নিষিদ্ধ করা ও মাছ ধরার সর্বনিম্ন আকার নির্ধারণ করে জালের ফাঁসের আকার নিয়ন্ত্রণ আইন প্রচলন করা হলে জাটকা রক্ষা পাবে, বাছাই করে ইলিশ মাছ ধরা সম্ভব হবে এবং ইলিশ মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

ইলিশ মাছের আবাসস্থল ও পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন

ইলিশ মাছের উৎপাদন বৃষ্টিপাত, পানি প্রবাহ ও তলানী পতনের (Siltation) ১৯৭৮ সালের পর থেকে ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণের ফলে পদ্মা নদীতে পানি প্রবাহ হ্রাস পাওয়ায় ইলিশের চলাচল ও আবাসস্থল ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। বৃষ্টিপাতের পরেই ইলিশের প্রাপ্যতার সাথে তলানী পতনের সবচেয়ে জোরালো (r = ০.৯৮) সম্পর্ক পাওয়া যায়। FCD, FCDI, Land Reclamation ইত্যাদি প্রকল্প গ্রহণসহ নানাবিধ মনুষ্যসৃষ্ট কারণে পদ্মা-মেঘনাসহ অনেক নদীর পানিপ্রবাহ হ্রাস পাওয়ায় ইলিশের প্রজননক্ষেত্র বিনষ্ট হয়েছে এবং সেই সাথে পরিবর্তিত হয়েছে এর বিচরণ ক্ষেত্র ও পরিভ্রমণ পথ। সহনশীল ইলিশ উৎপাদন বজায় রাখতে হলে অভিপ্রয়ানশীল ইলিশ মাছের চলাচল, খাদ্যগ্রহণ, প্রজনন ইত্যাদি কার্যকলাপ সংঘঠিত হয় যে সংবেদনশীল জলজ পরিবেশে, সেই পরিবেশের ভৌত রাসায়নিক গুণাবলীর সাথে ইলিশের প্রাপ্যতার যে নিগুঢ় সম্পর্ক রয়েছে সেই বিষয়ে সঠিক ধারণা নিয়ে ব্যবস্থাপনা কৌশলে কাজে লাগানো আবশ্যক।

ইলিশ মাছের আহরণ পরিসংখ্যান পদ্ধতি উন্নয়ন

বাংলাদেশে উম্মুক্ত জলাশয়ের অন্যান্য মাছের সাথে ইলিশ আহরণ পরিসংখ্যান নির্ণয় করা হয়। সময়ের বিবর্তন ও পরিবেশগত পরিবর্তনের সাথে নদ-নদীতে মাছ ধরার কাজে নিয়োজিত জেলে, জাল, নৌকা ইত্যাদির সংখ্যা পরিবর্তিত হয়েছে। অনুরূপভাবে ইলিশ রপ্তানীর পরিসংখ্যান অনুমানের ভিত্তি করে প্রণয়ন করা হয়। কার্যকর উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য ইলিশসহ অভ্যন্তরীণ উম্মুক্ত জলাশয়ের আহরণ পরিসংখ্যান হালনাগাদ করা অতীব জরুরী।

ইলিশ মাছ বিষয়ক প্রায়োগিক গবেষণা

ইলিশ মাছের জীবন-চক্র অত্যন্ত জটিল। এদের স্কুলিং, অভিপ্রয়াণ, ডিম ধারণ ক্ষমতা, প্রজনন সাফল্য, বৃদ্ধি ইত্যাদি পরিবেশগত উপাদানের সাথে সরাসরি নির্ভরশীল। এ সকল বিষয়সহ বর্তমান ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়নের ফলাফল নির্ণয়ের জন্য আধুনিক গবেষণা পরিচালনা ও গবেষণার ফলাফল মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন একান্ত প্রয়োজন। আধুনিক গবেষণা পরিচালনার জন্য ইনষ্টিটিউটের গবেষণা সামর্থ বৃদ্ধি ও দক্ষ জনবল তৈরীও গুরুত্বপূর্ণ।

জাটকা ইলিশ জেলেদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও বিকল্প কর্মসংস্থান

ইলিশ ও জাটকা আহরণে নিয়োজিত জেলেরা তাদের জীবন-জীবিকার জন্য প্রাণের মায়া উপেক্ষা করে নদীতে মাছ ধরে। তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থাও সুসংহত নয়। তাই অভয়াশ্রম বাস্তবায়নকালীন সময়ে এবং সর্বোচ্চ প্রজনন মৌসুমে মাছ আহরণ নিষিদ্ধকালীন সময়ে জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হলে জেলেরা নদীতে মাছ ধরা থেকে বিরত থাকবে ও ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। মৎস্য অধিদপ্তর ইতোমধ্যে জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে এবং ইলিশ জেলে/ মৎস্যজীবিদের খাদ্য সহায়তা দিয়ে তাদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে। এর ফলে জাটকা সংরক্ষণ এবং প্রজননক্ষম ইলিশ সংরক্ষণে ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে।

ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার জন্য আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা

জেনেটিক গবেষণার মাধ্যমে বাংলাদেশ, ভারত ও মায়ানমারে ইলিশের একটি মাত্র মজুদ সনাক্ত করা হয়েছে। তাই আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অভিন্ন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়ন করলে ইলিশের সহনশীল উৎপাদন বজায় থাকবে ও সার্বিক উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

উন্নত ব্যবস্থাপনা কৌশল বাস্তবায়নের ফলাফল ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি

বাংলাদেশে ১৯৮৩-৮৪ সাল হতে ইলিশ মাছের উৎপাদন মৎস্য অধিদপ্তরের ফিশারীজ রিসোর্স সার্ভে সিষ্টেম (FRSS) কর্তৃক ধারাবাহিকভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। উক্ত সূত্রের তথ্য অনুযায়ী বিগত ২০০১-০২ সালে ইলিশ আহরণের পরিমাণ ছিল ২২০,৫৯৩ লক্ষ মে.টন। বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা কৌশল বাস্তবায়নের ফলে বিগত ২০০১-০২ সালের তুলনায় ২০০৯-১০ সালে ইলিশের উৎপাদন ৪১.৭১% বৃদ্ধি পেয়েছে (সারণি-৩)।

সারণি ৩. বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা কৌশল বাস্তবায়নের ফলে ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি

সাল	ইলিশ উৎপাদন		ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি
	মে.টন	বৃদ্ধি (%)	
২০০১-০২	২২০,৫৯৩	-	পূর্বে প্রচলিত
২০০২-০৩	১৯৯,০৩২	(-) ৯.৮০	ঐ
২০০৩-০৪	২৫৫,৮৩৯	১৫.৯৮	জাটকা সংরক্ষণ
২০০৪-০৫	২৭৫,৮৬২	২৫.০৫	ঐ
২০০৫-০৬	২৭৭,১২৩	২৫.৬৩	জাটকা সংরক্ষণ ও অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা
২০০৬-০৭	২৭৯,১৮৯	২৬.৫৬	ঐ
২০০৭-০৮	২৯০,০০০	৩১.৪৬	জাটকা সংরক্ষণ, অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা ও প্রজননক্ষম ইলিশ সংরক্ষণ
২০০৮-০৯	২৯৮,৪৫৮	৩৫.৩০	ঐ
২০০৯-১০	৩১২,৬১২	৪১.৭১	ঐ

জাটকা আহরণের পরিমাণ হ্রাস ও তুলনামূলক প্রাচুর্য

বাংলাদেশের বিভিন্ন নদ-নদী ও উপকূলীয় এলাকায় কম-বেশী প্রায় সারা বৎসরই জাটকা পাওয়া যায়। তবে জাটকা ধরার প্রধান মৌসুম জানুয়ারী হতে এপ্রিল মাস পর্যন্ত। কোন কোন বৎসর জাটকা ধরার মৌসুম মে মাস পর্যন্তও বিস্তৃত হয়। বাংলাদেশে মোট ধৃত জাটকার প্রায় ৩০-৪০% এপ্রিল মাসে এবং ১৫-২৫% মার্চ মাসে অর্থাৎ মোট ধৃত জাটকার ৪৫-৬৫% এ দুই মাসে ধরা পড়ে। অপরদিকে উপকূলীয় এলাকায় জাটকা মাছের প্রাধান্য নভেম্বর হতে জানুয়ারী মাস পর্যন্ত থাকে এবং জানুয়ারী মাসেই সবচেয়ে বেশী পরিমাণে জাটকা ধরা পড়ে। ব্যাপক পরিমাণ জাটকা ধরার ফলে ইলিশ মাছের পুনঃসংযোগ বা প্রবেশন প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। এছাড়া, জাটকা ধরার জন্য ইলিশ মাছের Growth over fishing হয়। ফলে ইলিশের বর্ধিত উৎপাদন পাওয়া যাচ্ছে না।

১৯৯০ হতে ২০১০ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে ধৃত জাটকার তুলনামূলক চিত্রে দেখায় যায় যে, ১৯৯০ সালের তুলনায় ২০০০ সালের পর থেকে ৪-৫ গুণ বেশী জাটকা ধরা পড়েছে (সারণি-৪)। তবে বর্তমানে জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদেও বিকল্প কর্মসংস্থানসহ বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে জাটকা ধরার পরিমাণ ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে।

সারণি ৪. বিভিন্ন সময়ে ধৃত জাটকার তুলনামূলক চিত্র

সাল	ধৃত জাটকা (মে.টন)	হ্রাস/বৃদ্ধি (%)
১৯৯০	৩,৪৫৬	-
১১৯৪	৪,৪০০	+২৭
২০০০	১৯,২০০	+৩৩৬
২০০৪	১১,০০০	-৪৩
২০০৭	১৫,৭৪০	+৩০
২০০৮	১৭,০৭০	+৮
২০০৯	১৪,৪৫০	-১৫
২০১০	১৪,১৫০	-২

নিম্ন মেঘনা অববাহিকায় কারেন্ট জাল ব্যবহার করে পরীক্ষামূলকভাবে জাটকা আহরণে ২০১০ সালে প্রতি ১০০ মিটার জালে ঘন্টায় প্রায় ২.৪৪ কেজি জাটকা পাওয়া গিয়েছে।

সারণি ৫. মেঘনা নদীর বিভিন্ন অংশে জাটকার তুলনামূলক প্রাচুর্য

বৎসর	প্রতি ১০০ মিটার কারেন্ট জালে ঘন্টায় ধৃত জাটকার পরিমাণ (কেজি)	হ্রাস (%)	বৃদ্ধি (%)	ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি
২০০৫	০.৯৪	-	-	জাটকার অভয়াশ্রম
২০০৬	০.৬১	৩৫.১০	-	ঐ
২০০৭	০.৭২	-	১৮.০৩	ঐ+১০ দিন ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ
২০০৮	১.৮৯	-	১৬৩	ঐ
২০০৯	২.৩১	-	১৪৫	ঐ
২০১০	২.৪৪	-	১৬০	ঐ

ইলিশ সম্পদ সংরক্ষণের জন্য ২০০৫ ও ২০০৬ সালে অভিন্ন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (জাটকার অভয়াশ্রম) বলবৎ ছিল। কিন্তু ২০০৭, ২০০৮, ২০০৯ ও ২০১০ সালে জাটকার অভয়াশ্রম ও প্রধান প্রজনন এলাকায় ১০ দিন মাছ আহরণ নিষিদ্ধ থাকায় জাটকার প্রচুর্য পূর্বের তুলনায় ১৬০% বৃদ্ধি পেয়েছে। জাটকার প্রাচুর্যের সাথে ইলিশের প্রাচুর্য সরাসরি নির্ভরশীল। জাটকা সংরক্ষণ জোরদার, অভয়াশ্রম ঘোষণা এবং ১০ দিন মাছ আহরণ নিষিদ্ধ ইত্যাদি ব্যবস্থাপনা কৌশল বাস্তবায়নের ফলে ইলিশ মাছের সার্বিক উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।

ইলিশের প্রাকৃতিক প্রজনন সাফল্য

ইলিশের প্রাকৃতিক প্রজনন সাফল্য নিরূপণ সমীক্ষায় ২০০৮, ২০০৯ ও ২০১০ সালে যথাক্রমে প্রায় ৩৮.৭২%, ১৭.৬২% ও ৩৩.৬৯% প্রজনণোত্তর বা Spent ইলিশ মাছ পাওয়া গিয়েছে। অনুরূপ সমীক্ষায় ২০০২ ও ২০০৩ সালে যথাক্রমে ০.৫০% ও ১.৪০% প্রজনণোত্তর মাছ পাওয়া গিয়েছিল। অর্থাৎ বিগত ২০০২ সালের তুলনায় ২০০৭, ২০০৮, ২০০৯ ও ২০১০ সালে প্রাকৃতিক প্রজনন সাফল্যের হার যথাক্রমে প্রায় ১১, ৭৭, ৩৫ ও ৬৭% বৃদ্ধি পেয়েছে (সারণি-৬)।

সারণি ৬. ইলিশের প্রজনন সাফল্যের তুলনামূলক হার

বৎসর	প্রজনণোত্তর মাছের হার (%)	বৃদ্ধির পরিমাণ (%)	ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি
২০০২	০.৫০	-	পূর্বে প্রচলিত
২০০৩	১.৪০	২.৮	জাটকা রক্ষা অভিযান
২০০৭	৫.৪০	১০.৮	জাটকা রক্ষা +১০দিন ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ+অভয়াশ্রম
২০০৮	৩৮.৭২	৭৭.৪৪	জাটকা রক্ষা +১০দিন ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ+অভয়াশ্রম
২০০৯	১৭.৬২	৩৫.২৪	জাটকা রক্ষা +১০দিন ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ+অভয়াশ্রম
২০১০	৩৩.৬৯	৬৭.৩৮	জাটকা রক্ষা +১০দিন ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ+অভয়াশ্রম

ডিম ও জাটকা উৎপাদনে সাফল্য

প্রজনন মৌসুম (২০১০) ১০ দিন ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ থাকায় যথাক্রমে প্রায় ১.৫১ কোটি ইলিশ মাছ আহরণ হতে রক্ষা পেয়েছে। আহরণরহিত ইলিশ হতে ৩৩৬,১৯৯ কেজি ডিম প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত হয়েছে। উৎপাদিত ডিমের পরিস্ফুটনের হার ৫০% হিসাবে প্রায় ১৬৮,০৯৯ কোটি রেণু উৎপাদিত হয়েছে এবং উক্ত রেণুর বাঁচার হার ১০% হিসাবে প্রায় ২১,০১২ কোটি রেণু পোনা/জাটকা চলতি বৎসর ইলিশ জনতায় নতুনভাবে সংযুক্ত হবে বলে ধারণা করা যাচ্ছে (সারণি-৭)।

সারণি ৭. বর্ধিত ডিম ও জাটকা উৎপাদন পরিমাণ

বৎসর	ডিম উৎপাদন (কেজি)	প্রতি গ্রামে গড় ডিমের সংখ্যা	৫০% হ্যাচিং রেটে রেণু উৎপাদনের সংখ্যা (কোটি)	১০% বাঁচার হাওে জাটকা উৎপাদনের সংখ্যা (কোটি)
২০০৭	৪৬,৮০০	১২,৫০০	২৯,৩০০	২,৯৩০
২০০৮	৩৯২,৬২০	১২,৫০০	২৪৫,৩৮৫	২৪,৫৩৮
২০০৯	১৭০,২০	১২,৫০০	৮৫,২১০	৮,৫২১
২০১০	৩৩৬,১৯৯	১২,৫০০	১৬৮,০৯৯	২১,০১২

ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতিবন্ধকতা

১। সর্বোচ্চ প্রজনন মৌসুমে অবাধে ইলিশ মাছ আহরণ করার ফলে এ মাছের প্রাকৃতিকভাবে ডিম তথা পোনা উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে

২। ব্যাপকভাবে জাটকা ধরার ফলে এ মাছের নতুন প্রজন্মের প্রবেশন, জাটকাকে বৃদ্ধির সময় না দিয়ে ধরার ফলে গ্রোথ ওভার ফিসিং এবং পূর্ণ বয়স্ক মাছকে রক্ষা না করার ফলে রিক্রুটমেন্ট ওভার ফিসিং হচ্ছে

৩। ইলিশ মাছের জীবনচক্রের প্রায় সকল স্তরে আহরণ জনিত মৃত্যু

৪। এছাড়া বিভিন্ন কারণে নদ-নদীর পানি প্রবাহ হ্রাস, পরিবেশগত পরিবর্তন এবং জলজ দূষণের কারণে অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের ইলিশ মাছের অনেক বিচরণ ও প্রজনন ক্ষেত্র এবং জাটকা ইলিশের চারণ ক্ষেত্র নষ্ট হয়ে গিয়েছে যা ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।

বর্তমান গবেষণা কার্যক্রম

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, নদীকেন্দ্র, চাঁদপুরে জাটকা/ ইলিশের প্রজনন, বিচরণ, সর্বোচ্চ সহনশীল উৎপাদন, ইলিশ জনতার গতিবিদ্যা, নদ-নদীর ইকোলজি বিষয়ক গবেষণা, ইলিশের জীবন-চক্র ও উৎপাদনশীলতার ওপর পরিবেশ ও জলবায়ুগত উপাদানের প্রভাব বিষয়ক গবেষণা বর্তমানে পরিচালিত হচ্ছে। এসব গবেষণার মাধ্যমে

ভবিষ্যতে ইলিশ/জাটকার বিচরণক্ষেত্র/ প্রজননক্ষেত্রের পরিবর্তন বা নুতন বিচরণক্ষেত্র/ প্রজননক্ষেত্র সনাক্ত করা, জাটকা/ ইলিশের প্রাচুর্য নির্ণয়, ইকোলজিক্যাল ষ্টাডির মাধ্যমে জাটকা/ ইলিশের আবাসস্থলের পরিবর্তন, ইলিশের অভিপ্রায়ণ পথের পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয়ে নুতন তথ্য পাওয়া যাবে যার ফলে জাটকা/ ইলিশের আরো উন্নত ব্যবস্থাপনা কৌশল নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। এর ফলে জাটকা/ ইলিশের অধিকতর সংরক্ষণ নিশ্চিত করা যাবে ও উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।

উপসংহার

বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অবলম্বন তথা-জাটকা সংরক্ষণ, অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা ও প্রজননক্ষেত্রে মা ইলিশ ধরা নিষিদ্ধকরণের ফলে ইলিশের উৎপাদন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে, প্রতি বছরই বিভিন্ন নদ-নদীতে জাটকার আধিক্যও বৃদ্ধি পাচ্ছে। চলমান ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়ন অব্যাহত থাকলে আগামী ৫ বছওে ইলিশের মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৩.৫ লক্ষ মে.টনে উন্নীত হবে যার বাজার মূল্য প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা (প্রতি কেজি ৩০০/- হারে)। বর্তমানে বাস্তবায়িত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির পাশাপাশি ভবিষ্যতে বাছাই কওে বড় ইলিশ ধরার জন্যে জালের ফাঁসের আকার নিয়ন্ত্রণ, উপকুল ও সমুদ্র এলাকায় ইলিশ সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন, মনিটরিং এবং সার্ভিলেন্স জোরদারকরণ, ইলিশ আহরণের জন্য বিভিন্ন প্রকার জাল, নৌকা ও ইলিশ উৎপাদনের নির্ভরশীল পরিসংখ্যান নিরূপন, জলমহাল ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উন্নয়ন, আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধি, গণসচেতনতা সৃষ্টি ও আধুনিক ইলিশ গবেষণা ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয় কার্যকর করার জন্যে বাস্তব উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।